সন্ত্রস্ত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

জুলাই, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের পথিকৃৎ

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন তথা তথা রাজ্যের শিক্ষক, কর্মচারী ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সংগঠক কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২৪ জুলাই, ২০১৯ কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারী সংগঠন-আন্দোলনের গঠনপর্বের অন্যতম পুরোধা ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের এক অবিসংবাদী নেতা।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ ১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের পিতা অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। আচার্য প্রফুলচন্দ্রের পিতৃনামে প্রতিষ্ঠিত ঐ গ্রামেই আর কে বি হরিশচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এক স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার পুত্র ও তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবেশের মধ্যে তিনিও নিজেকে এক বিশেষ মানসিকতায় তৈরী করেছিলেন। যার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে অন্যান্য বহু পরিবারের মতো মুখোপাধ্যায় পরিবারেও নেমে আসে দুর্যোগ। বাবা, মা, পাঁচ ভাই ও দুই বোনের বৃহৎ পরিবার অবিভক্ত ২৪ পরগণার রহড়ায় বসবাস শুরু করে। এই বৃহৎ পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয় মুখোপাধ্যায়ের উপর। বাঁচার জন্য সামান্য কিছু ব্যবসা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে সফলতা পাননি। যদিও এরই মধ্যে এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যুবক অজয় মুখোপাধ্যায় স্থানীয়ভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবৈতনিক স্কুল পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানের বিধি অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পিএসসি-র প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে মহাকরণে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগে অবরবর্গীয় করণিক হিসাবে যোগদান করেন। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সালে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, পাঁচ বছরেই তার স্বপ্নভঙ্গের শুরু। ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ থেকে শুরু হয়েছিল দিকে দিকে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা ও নিজস্ব পরিসরে কর্মচারীর আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গ ছিল সেই আন্দোলনগুলির কেন্দ্রবিন্দু।

মহাকরণের অলিন্দে তখন কর্মচারী আন্দোলনের সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল। যুবক অজয় মুখোপাধ্যায় অচিরেই সেই আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিলেন। চাকরীতে যোগদানের দিন থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের অন্যতম পথিকৃৎ সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ

এ্যাসোসিয়েশনের কর্মী ও নিজস্ব যোগ্যতার গুণে দ্রুত এই সংগঠনের নেতৃত্বে উন্নীত হন। মহার্ঘভাতার আন্দোলন, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন, নন পি এস সি কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের আন্দোলন, কর্মচারী সমাজকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র সচিবালয়ের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে তিনি সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তৎকালীন সময়ে সেক্রেটারিয়েট সমিতির সুশীল দাস, নিতাই হরি কর মজুমদার, ভবতোষ রায়, সত্যেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃত্বের সঙ্গে। মৌলিক দাবী অর্জন কোন একটি সমিতির পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে তৎকালীন সময়ে গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলির যৌথ আন্দোলন-সংগ্রাম। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ্য কারিগর এবং তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, কমরেড নরেন গুপ্ত, কমরেড সুকোমল সেন প্রমুখ নেতৃত্বের সঙ্গে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিপালন করেছিলেন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ভারতবর্ষের তৎকালীন সময়ে যখন অন্যান্য রাজ্যের সচিবালয়ের কর্মচারীরা আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিজেদেরকে কুলীন চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, সেই সময়ে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে এই রাজ্যের সচিবালয়ের সংগঠনকে সংগ্রাম-আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করেছিলেন।

এই সময়ে, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রশাসনিক চাপ সহ্য করতে না পারায় পদত্যাগ করলে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় ১৯৫৭ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। আমৃত্যু তিনি ঐ সংগঠনের আজীবন সদস্য হিসাবে কার্যকরী কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন।

১৯৫৬ সালের কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠনপর্ব থেকেই তিনি এই সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। কমরেড মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সুদক্ষ নেতৃত্বের অসামান্য সাংগঠনিক ভূমিকার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করেনি—সমগ্র জনগণের দাবীকে সামনে রেখেই সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনা করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ষাটের দশক থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কমরেড মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৯ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অংশের কর্মচারীদের চেতনা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ১৯৬৮ সাল থেকে মুখপত্র প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে এই মুখপত্রের ''আন্দোলনের খবর'' ও পরবর্তীতে ''সংগ্রামী হাতিয়ার'' নামকরণ করা হয়। কমরডে মুখোপাধ্যায় ''আন্দোলনের খবর''-এর প্রথম

তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

রাজ্য কাউন্সিলের অষ্টম সভা

সংগঠন-আন্দোলনকে পরিস্থিতি উপযোগী করে গড়ে তোলার আহ্বান

বিজয় শংকর সিংহ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিলের অষ্টম সভা বিগত ৩-৪ আগস্ট ২০১৯ কলকাতার কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।৩ আগস্ট বিকাল ৪টায় রাজ্য কাউন্সিল সভা শুরু হয়। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাউন্সিল সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং সহসভাপতিত্রয় সুর্নিমল রায়, গীতা দে ও প্রশান্ত সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতেই সভাপতি কর্তৃক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম পুরোধা নেতৃত্ব তথা গোটা দেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১৩ আগস্ট ২০১৯

৬ দফা দাবিতে বিশাল কেন্দ্রীয় মিছিল

কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করা, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগসহ ৬ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয় ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত।

সম্পাদকীয়

আর এস এস ও ভারতীয় গণতন্ত্র

যেকোনো সাধারণ নির্বাচন, একটি দেশের (যে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে) নাগরিকদের কাছে ক্ষমতাসীন দলের বিগত সময়কালের (সাধারণভাবে পাঁচ বছর) ভূমিকা ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। এক্ষেত্রে পর্যালোচনার বিষয় গুলি হয় ঃ গত পাঁচ বছরে সরকারের ভূমিকা কি ছিল? গত নির্বাচনে তারা যে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন তা কার্যকরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা? না কি তারা প্রতিশ্রুতি একরকম দিয়ে অন্যপথে হাঁটার চেষ্টা করেছে? জনজীবনে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। একই সাথে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বিরোধী শক্তি হিসেবে গত পাঁচ বছরে কাজ করেছে, তাদেরও বা বক্তব্য কি? তারা জনস্বার্থে কোন বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকরী বক্তব্য হাজির করতে পারছে কি না তাও নাগরিকবৃন্দ তথা নির্বাচকমণ্ডলীর বিচার্য বিষয় হয়। তবে এসবই হল, সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা। বাস্তবে নির্বাচক মণ্ডলীর চিন্তা ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। চেষ্টা করা হয় বারবার মূল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে। এটা করা হয়, মানুষের না পাওয়ার যন্ত্রনা থেকে উদ্ভূত ক্ষোভকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে। যাতে তা, এই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই ফেটে না পরে।

বিশ্ব ইতিহাসের কথা যদি বাদও দিই, আমাদের দেশেই স্বাধীনতা উত্তর সাত দশকের ইতিহাসে এমন বেশ কিছু নজির রয়েছে। যেখানে আকর্ষণীয় বিভিন্ন স্লোগানের আড়ালে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি হাজির করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সবসময় যে এই কৌশল সফল হয়েছে তা নয়। বহুক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় স্লোগানের অন্তঃসার শূন্যতা সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরে ফেলতে পেরেছেন। বিভিন্ন সময়ে শাসকদলের ক্ষমতায় মসনদ আঁকরে ধরে রাখার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, মিডিয়ার দাপট যত বাড়ছে, যত বেশী মানুষ মিডিয়ার প্রচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাস্তায় হাঁটছেন, ততই যেন শাসক দলের পক্ষে বিভ্রান্ত করার কৌশল সহজেই কার্যকরী হচ্ছে। অবশ্য এখানে মিডিয়ার প্রচার বলতে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে মিডিয়ার পরিবর্তিত প্রচার প্রক্রিয়ার কথাই বলা হচ্ছে। অতীতে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে জনচেতনা ও জনমত গঠনে মিডিয়া যে ভূমিকা পালন করত, বর্তমান সময় সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে মিডিয়া কোন লুকোছাপা না রেখেই কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির পক্ষে সওয়াল করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে।

শাসকদল বা গোষ্ঠীর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার যে কৌশলগুলি সম্পর্কে আমরা এযাবৎকাল অবহিত ছিলাম, সেগুলিকে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে এক ভিন্ন মাত্রার কৌশল আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে। অথচ এবারে কাজটা অনেকটাই কঠিন ছিল। কারণ গত পাঁচ বছরে শাসকদলের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ জনসাধারণকে যেভাবে পিষ্ট করেছে, তার পরেও তাদের প্রচার কৌশল সফল হবে এমনটা ভাবা যায়নি, এমনকি নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তেও। কিন্তু যা ভাবা যায়নি, তাই ঘটেছে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল শুধু ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন তাই নয়, আগেরবারের থেকেও বেশী জনসমর্থন নিয়ে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। কোন্ প্রচার কৌশল এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল? শাসকদলের গৃহীত প্রচার কৌশলের প্রথম বৈশিষ্ট ছিল, সম্পূর্ণ ব্যক্তি (মোদী) কেন্দ্রীক মজবুত সরকার গঠনের আহ্বান। অতীতেও ইন্দিরা গান্ধীকে সামনে রেখে কংগ্রেস ব্যক্তি কেন্দ্রীক প্রচার করত। কিন্তু কংগ্রেসের সেই ব্যক্তি কেন্দ্রীক প্রচারে ইন্দিরা সরকারের কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপকে (যেমন বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে ভারত সরকারের ভূমিকা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ইত্যাদি) ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীক যে প্রচার সেখানে কোন সাফল্যের উপাদান ছিল না। তৎসত্ত্বেও প্রচার করা হল, যে দেশে বর্তমান সময়ে দরকার একজন সৎ, সাহসী, প্রাজ্ঞ ও পরম জাতীয়তাবাদী একজন নেতা এবং নরেন্দ্র মোদীই হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। ফলে নরেন্দ্র মোদীর কোন বিকল্প নেই! এই প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য, সমান্তরালে আরও একটা প্রচার করা হল। তা হল, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাই (পড়তে হবে পাকিস্তান) এখন দেশের সামনে সব থেকে বড় বিপদ। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি সংকট, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ইত্যাদি কোন সমস্যাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল দেশকে রক্ষা করা। যা পারেন একমাত্র মোদীজীর মতন শক্তিমান নেতাই।

যা বিস্ময়কর তা হল, সোহার্দ্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দু'হাজার বছরেরও বেশী সময়ের এই সভ্যতা, যেখানে গত সাত দশক ধরে গণতন্ত্র মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে জনসাধারণের মনে এক ধরনের সুরক্ষার অভাব বোধ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। আর এই প্রচার আরো বেশি পোক্ত হলো পুলওয়ামার ঘটনার পর। পুলওয়ামা ও বালাকোটের ঘটনা মোদিজীকে সামনে রেখে যে প্রচার, তাকে ঝড়ে পরিণত করলো। পুলওয়ামা ও বালাকোটের ঘটনা যেমন উগ্র জাতিয়তাবাদী প্রচারের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলকে বিপুল নির্বাচনী সাফল্য (যা নির্বাচন পর্বের শুরুতে ভাবাই যায়নি) এনে দিয়েছিল, ঠিক তেমনই তা আর এস এস-বিজেপির 'মিশন কাশ্মীর' পরিকল্পনার সূত্রপাতও ঘটিয়েছিল। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার ফলে ও পরিকল্পনামাফিক উগ্র জাতিয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক প্রচার ফলদায়ী হচ্ছে এটা লক্ষ্য করেই সংঘ পরিবার, এতদিন যা ছিল শুধুমাত্র তাদের প্রচারের বিষয়, তাকেই আইনী বৈধতা দেওয়ার বেপরোয়া পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি এদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে কম বেশি জায়গা পেতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের বিভিন্ন নির্বাচনে তাদের উপস্থিতি নির্বাচকমন্ডলীর একাংশ দ্বারা স্বীকৃত হতে শুরু করে। এই সময় থেকে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন তিনটি বিষয়কে তারা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। ১. বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ, ২. অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ও ৩. কাশ্মীর সম্পর্কিত সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বাতিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, উল্লিখিত তিনটি বিষয়েরই অন্তর্নিহিত মূল উপাদান হলো, সংখ্যা লঘু বিদ্বেষ (মুসলিম) ও আর এস এস-র হিন্দুরাষ্ট্র প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের অবস্থানজনিত। কিন্তু যেহেতু ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, ও আর এস এস তথা সংঘ পরিবারকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করতে হচ্ছে, তাই উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে নিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে তারা কিছুটা ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রামমন্দির নির্মাণ ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের মতো শাখা সংগঠনগুলিকে। কিন্তু কাশ্মীর প্রসঙ্গটি যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে একটি রাজনৈতিক ইস্যু, তাই সরাসরি ধর্মীয় ভাবনাকে এর সাথে যুক্ত করা কঠিন। তাই কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজনৈতিক শাখা বিজেপিকে।

আশির দশকে বারবার নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর নাগপুরের সিদ্ধান্তক্রমে নব্বই দশকের গোড়ায় বিজেপি রামমন্দির নির্মাণ ইস্যুটিকে নিজেদের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে। পরবর্তী ঘটনাবলী সকলেরই জানা। কিন্তু প্রাথমিক প্রচারটা শুরু করেছিল আর এস এস-র অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলি।

কাশ্মীর প্রসঙ্গটি নিয়ে অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলিকে যে প্রচারে নামানো হয় না তা নয়, কিন্তু মূল প্রচারটি করে রাজনৈতিক শাখা। আবার বিজেপির আত্মপ্রকাশের পর থেকেই কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা নিয়ে প্রচার শুরু হয়েছে তাই নয়, বিজেপির পূর্বসূরী জনসংঘ ৩৭০ ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। জনসংঘের নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে যেমন বাংলা ভাগের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তেমনই কাশ্মীরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ারও বিরোধিতা করেছিলেন। শুরু থেকেও এই বিরোধিতার কারণটা খুব স্পষ্ট। দেশভাগের সময় কাশ্মীরের স্বাধীন অবস্থান, পরবর্তীতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের লড়াই ও স্বেচ্ছায় ভারতভুক্তির জন্য চুক্তি (ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেসন) এর কোনো কিছুই জনসংঘ বা বিজেপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংঘ পরিবারের কাছে কাশ্মীর শুধুমাত্র ভারত পাকিস্তান সীমান্তে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য ও ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ৩৭০ ধারার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে স্বাধীন রাজন্যশাসিত রাজ্য কাশ্মীরের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে চুক্তি, তাই ৩৭০ ধারা হিসাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আর এস এস ও বিজেপির প্রচার হলো কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য বলেই ৩৭০ দারা মোতাবেক তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষপ্রসূত এই প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তারা সংবিধানের ৩৭১ নং ধারার বিভিন্ন উপধারা সম্পর্কে নীরব থাকে। সেখানে উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে (যেগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়) বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

আসলে ৩৭০ ধারা বাতিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা বা রাম মন্দির নির্মাণ— এই সবকিছুই হল আমাদের সংবিধানে বর্ণিত 'ভারত' সম্পর্কিত ধারণাকে নস্যাৎ করার হিন্দুত্ববাদী অপচেষ্টা। সঙ্ঘ পরিবার ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন স্লোগান ও ঘোষিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সংবিধানে উল্লিখিত সামাজিক সাম্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণার বিপ্রতীপে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে 'জাতীয়তা' সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। আর এস এস-এর এই লক্ষ্য স্পষ্ট হয়, তাদের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের বক্তব্যে। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদের সভায় দেশের সংবিধান গৃহীত হয়। এর ঠিক চারদিন পর ৩০ নভেম্বর আর এস এস-এর মুখপত্র অর্গানাইজার পত্রিকায় গোলওয়ালকার লেখেন, 'এই সংবিধানে ভারতের নিজস্ব আবহমানকালের বিধি মনুস্মৃতি থেকে কিছুই নেওয়া হয়নি। এই সংবিধানে এমন কিছুই নেই যা ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য বলে মেনে নেওয়া যায়।' সংবিধান প্রণয়নে যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই আম্বেদকরের সামাজিক সাম্য সম্পর্কিত ধারনার বিরোধিতা করে গোলওয়ালকার লেখেন, ''জাত ভিত্তিক সাম্য মনুস্মৃতি সম্মত নয়, ফলে এ দেশের হিন্দুরা তা মানবে না।''

স্বভাবতই কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল শুধুমাত্র মোদী সরকারের কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। এটি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শকে সংবিধান স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শের ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া। ফলে মতাদর্শগত লড়াইকে জোরদার করেই এর মোকাবিলা করতে হবে। □

১৪ আগস্ট, ২০১৯

।। সংগঠন সংবাদ।। ।। সংগঠন সংবাদ।। ।। সংগঠন সংবাদ।। ।। সংগঠন সংবাদ।।

রক্তদান শিবির

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যৌথ উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আলিপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি দপ্তরে ৮ আগস্ট ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়, কর্মসূচী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ফুয়াদ হালিম। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে দুই শতাধিক কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ১জন মহিলাসহ ৪০ জন রক্তদান করেন। একইসঙ্গে শতাধিক কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ব্লাড সুগার, ইসিজি ও চক্ষু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার ফুয়াদ হালিমসহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক অঞ্জন বসু ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মানসকুমার বড়ুয়া। সভা পরিচালনা করেন দেবাশীষ ব্যানার্জী ও পিনাকী বাগচীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

সংবর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীগণ

গত ২৮ জুলাই, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পরিবার সহ সদস্য/সদস্যাদের মিলনোৎসবে সদস্য/সদস্যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুত্র কন্যাদের সম্বর্ধনা প্রদান এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের চারজন মেধাবী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীকে দশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা সহ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক টিমের পরিচালনায় উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে সত্যপ্রিয় ভবনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীটির সুচনা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিখিল রঞ্জন পাত্র। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী তাঁর বক্তব্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার এই কর্মসূচীর জন্য সমিতির উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ডঃ পবিত্র সরকার তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের জীবনে সফল হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যত সমাজের নাগরিক হিসাবে মানব কল্যাণের পতাকা তাদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বক্তব্যের শেষে তিনি ৬০-এর দশকে বিখ্যাত হওয়া কান্ট্রি সং 'ফাইভ হানড্রেড মাইলস আওয়ে ফ্রম হোম' নিজের গলায় গেয়ে আজকেও অনেক সফল ছাত্রছাত্রীদের নিরুপায় পরিযায়ী জীবনের বাস্তবতা যে সমাজের ক্রুরতারই পরিচয় বহন করে। সেটাই ধরিয়ে দিতে চাইলেন।

শ্রী তাপস দাস, মুখ্য বনপাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা সহ পরিবেশ সচেতনতার কথা মাথায় রেখে এই কর্মসূচীতে 'বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ' বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ সরকার, যুগ্ম সহাধ্যক্ষ, মুদ্রাঙ্ক রাজস্ব। সংবেদনপূর্ণ গানের পরিবেশন শ্রোতৃমণ্ডলীকে আবিষ্ট করে রেখেছিল।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী এবং সঞ্চালনা করেন অসীম পাল। □

শরিক-এর অনুষ্ঠান

গত ৮ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মুখপত্র 'শরিক'-এর ৫১তম বর্ষে প্রকাশিত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে শরিক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ডাইরেক্টরেট থেকে আগত ১৯টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত পঠন-পাঠনের অভ্যস্ততা সদস্যদের মধ্যে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিগত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে সমিতি এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। প্রায় শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে কর্মসূচীটি পালিত হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখেছেন নিখিল রঞ্জন পাত্র। □

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে বর্ধমান জেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জেলার বিভিন্নপ্রান্তে সংগঠনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী চলছে।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

শেষ শয্যায় কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিজয় শংকর সিংহ

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মলয় রায়

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জ্যোতিপ্রসাদ বসু

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহ্বায়ক ও ''সংগ্রামী হাতিয়ার''-এর প্রথম সম্পাদক হিসাবে ১৯৬৮-১৯৭৯ পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালনা করেন যা আজও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রচারিত ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম।

শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী আন্দোলন নয়, বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি পরিষ্ঠিত হয ১৯৬৬ সালে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকারী , বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের ও শিক্ষকদের যৌথ সংগ্রামের মঞ্চ ১২ই জলাই কমিটি কমরেড কে জিড বসু, কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, কমরেড সত্যপ্রিয় রায়, কমরেড অনিলা দেবী, কমরেড দীপেন ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন এদের অন্যতম সহযোদ্ধা। এই সংগঠনের নেতৃত্বের কোন পদে তিনি না থাকলেও এই সংগঠনের বিকাশ ও পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সারা ভারতবর্ষের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে। কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, কমরেড সুকোমল সেনের সঙ্গে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ও এই সংগঠন পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে এই সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি ও পরবর্তীতে অনারারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃত্বের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। এই সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা,ফিলিপাইনস, কিউবা প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের পরেই তিনি বামপন্থী শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে পরপর চারবার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। সাংসদ হিসাবেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। সংসদে শ্রমিক-কর্মচারী-মেহনতী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে তিনি বারংবার সোচ্চার হয়েছেন। পেনশন প্রথা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সংসদে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে কৃষ্ণনগর সংসদীয় এলাকার জনগণের কাছে তিনি জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধার ব্যক্তি ছিলেন।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলন সহ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণীয়। এই কারণে, তিনি বিভিন্ন সময়ে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। বারে বারে শো-কজ, সাসপেনশন এবং সর্বোপরি ১৯৭০ সালে তিন দিনের ধর্মঘট সংগঠিত করা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় অন্যান্য ১২ জন নেতৃত্বের সঙ্গে তিনিও চাকরী থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি সহ অন্যান্যরা চাকুরীতে পুনর্বহাল হন। এছাড়াও ১৯৭১ সালে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসে তাঁকে সপরিবারে রেহড়া থেকে চলে যেতে হয়। ১৯৭২ সালে রিগিং নির্বাচনের দিনে কংগ্রেসী গুন্ডাদের গুলি বোমার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সংগ্রামী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এক অকুতভয় ঋজুব্যক্তিত্ব। এই সমগ্র আক্রমণকে মোকাবিলা করেই তিনি কর্মচারী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করলেও তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতি-সচেতন সংবেদনশীল মানুষ। তাঁর বাগ্মীতা সমগ্র কর্মচারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করত। যুক্তি ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে তাঁর বক্তব্য ছিল শিক্ষণীয়। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ এমন কোন কর্মচারী সংগঠনের মুখপত্র নেই যে সেখানে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন ''গণ আন্দোলনের ধারা' প্রকাশিত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরী করতে পারতেন। ১৯৬০ সালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সুবিশাল কর্মচারী অবস্থানে তাঁর স্লোগান ''আমরা দেশের সেবক-গোলাম নই'' আজও দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক। কমরেড মুখোপাধ্যায় ভালো আবৃত্তিকার ও অভিনেতা ছিলেন। একদা তিনি রবীন্দ্রনাথের ''দুই বিঘা জমি'' কবিতার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং এর তার সফল অভিনয় দীর্ঘদিন যাবৎ হয়েছিল। প্রগতিশীল নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র দেখতে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন।

একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুত্র হিসাবে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় সমগ্র জীবনে এক শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে এগিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি বামপন্থী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন আমৃত্যু গভীরভাবে আস্থাশীল।

সারা জীবনে সদা ব্যস্ততার মধ্যেই বেশ কয়েকবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। কিন্তু কোন অসুস্থতা তাঁকে সংগ্রাম-আন্দোলন থেকে বিরত করতে পারেনি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মানুবর্তী জীবনের মধ্যে থেকেই সবসময় মিছিলের সামনে থেকেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। শারীরিক কারণে আন্দোলনের ময়দানে অনুপস্থিত থাকেননি। বিগত চার বছর বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য শারীরিকভাবে সংগ্রাম আন্দোলনে যোগদান করতে না পারলেও বিভিন্নভাবে সংগঠন-কর্মী-নেতৃত্বকে তাঁর উপদেশ, মতামত জানিয়েছেন। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অন্যতম সংগ্রামী স্থপতি, রূপকার, প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ ছয় দশকের বেশীসময় ধরে তিনি কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বে অবস্থান করেছেন। একইসাথে বৃহত্তর পরিসরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ ক্লান্তিহীন, বহুমুখীন সাংগঠনিক জীবনের অবসান ঘটেছে। কমরেড মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের এক বিশাল ক্ষতি। কিন্তু তাঁর জীবনাবসান ঘটলেও যতদিন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন তিনি আমাদের মধ্যে অনির্বাণ শিখার মত প্রজ্জ্বলিত থাকবেন। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় লাল সেলাম। □

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মনোজ কান্তি গুহ

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সমীর ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন শিবশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র অভীক মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন যুক্ত কমিটির নেতা তাপস ত্রিপাঠী

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল

জনস্বার্থে সংসদে সরব কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়

লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ

লোকসভায় গত ২৬শে জুলাই '৯৩ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে সাংসদ অজয় মুখোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, এখানে সেই ভাষণের মূল অংশের ভাষান্তরিত রূপ পরিবেশিত হলো।—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

প্রায় দু'বছর আগে শ্রীনরসিম্হা রাওয়ের নেতৃত্বে নবগঠিত কং (আই) সরকার এই সভাতেই আস্থাসূচক ভোট প্রার্থনা করেছিলেন। বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। আমাকে বলতেই হবে যে তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ যাঁরা এই সভায় বিরোধীপক্ষে বসে রয়েছি তাঁদের অনেককেই খুশি করতে পেরেছিল। তিনি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

'জনসমর্থন কংগ্রেসের পক্ষে ফিরে এলেও এসেছে কিন্তু সতর্কবাণসহ। তারা বলছেন কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারে বটে, তবে তারা যেন দুর্বিনীতভাবে সরকার না চালান, কংগ্রেসকে আন্তরিক প্রয়াস নিতে হবে, যাতে পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে সহমতে পৌঁছাতে পারে।"

তিনি আরও যা বলেছিলেন সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করতে চাইছি।

"আমরা এমন কিছু পদক্ষেপ নেব না যা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কিংবা দরিদ্র জনগণের মঙ্গলের লক্ষ্যে প্রণীত কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুত কর্মসূচীর বিরুদ্দে থাকে। এই গ্যারান্টিটুকু আমি এই সভাতে দিতে পারি। আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি / কর্মসূচী অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত। এই মুহূর্তে আমি কংগ্রেস (আই)-এর কর্মসূচীর বিশদ বিবরণে যেতে চাই না, প্রয়োজনে পরবর্তীকালে তা করবো। তবে এটুকু বলতে পারি সাধারণ মানুষের জন্য এটা করবো, ওটা করবো এসব কথাই ওখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে...."

রাও সরকার গুটি দুয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ করে ছেড়েছে যে ঐসব প্রতিশ্রুতি ছিল ভাঁওতা, স্তোকমাত্র। চিতাভাব তার গায়ের ডোরাকাটা দাগ পাল্টে ফেললেও ফেলতে পারি, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের পক্ষে জনবিরোধী নীতি পাল্টানো একেবারেই অসম্ভব। বরঞ্চ যতদিন যাবে এই নীতিগুলো আরও নির্বিবেকী কঠোর হয়ে উঠবে। সাধারণ মানুষ, নিঃসহায় মানুষ (দি ম্যান অন দি স্ট্রিট), শ্রমজীবী জনগণ, গ্রামীণ মানুষ, দরিদ্র জনসাদারণ, প্রান্তিক চাষী, খেত মজুররা তাদের কোমরের কষি আরো আঁটো করে বাঁধার উপদেশামৃত ছাড়া আর কিছুই নাবে না। এবং সরকার তাদের দুর্দশা লাঘবের কোনো চেষ্টা করবে না, বরং যাতে তা আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে, সর্বতোভাবে সেটাই করে যাবে।

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এটা খুবই গরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এখানকার সকলেই আমরা সংবিধানের নীতির প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছি। আমি ৩৮নং ধারাটি উদ্ধৃত করছি, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

(১) জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের প্রেরণা দান করে এরূপ একটি সমাজ ব্যবস্থা যথাসাধ্য কার্যকরভাবে প্রবর্তন ও রক্ষণ করিয়া রাজ্য জনকল্যাণ বর্ধনের প্রয়াস করিবে।

(২) রাজ্য, কেবল ব্যক্তিগণের মধ্যেই নহে, বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত জনসমষ্টির মধ্যেও, বিশেষতঃ, আয়ের অসমতা হ্রাস পরিবার জন্য প্রয়াস করিবেন এবং প্রতিষ্ঠা, সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

৩৯নং ধারায় বলা আছে ঃ

'রাজ্য, বিশেষতঃ স্বীয় কর্মপদ্ধতি এরূপ চালিত করিবেন, যাহাতে—(ক) নাগরিকগণ, পুরুষ ও নারী সমভাবে, যেন পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রাপ্ত হন;

(খ) জনসমাতের পার্থিব সম্পদের স্বামিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এরূপে বণ্টিত হয় যেন সর্বোত্তমভাবে সাধারণের হিত সাধিত হয়;

(গ) আর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্রিয়ার পরিণতি এরূপ না হয় যে সাধারণের ক্ষতিসাধন করিয়া ধন ও উৎপাদনের উপায়সমূহের সংকেন্দ্রন ঘটে।"

স্যার, আমি জানি উল্লিখিত নীতিসমূহের দু'একদিনে বাস্তবায়ত বা ফললাভ সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার যে ঐগুলি রূপায়ণের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চান, সেই অভিপ্রায়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ তো নিদেনপক্ষে ঘটাবেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই সরকার ঠিক এর বিপরীত কাজই করে চলেছে। সরকারের আর্থিকসহ অন্যান্য নীতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের ফলে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ধনাঢ্য ভূস্বামী ও বিদেশী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মতো মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষ পরিসংখ্যানের ভোজবাজীতে আগ্রহী নন। অর্থনৈতিক সঙ্কটের যে বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছে সেই সার্বিক দুঃসহ বোঝার ভারে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে।

স্যার, সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ যে আজ টগবগিয়ে ফুটছে সেই সম্পর্কে সরকার যে ওয়াকিবহাল নয়, তা নয়। ভারতের মেহনতি শ্রেণী এ বিষয়ে ভালোমতো জানান দিয়েছেন পরপর দু'দুটি দেশব্যাপী ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে—গত ২৯ নভেম্বর '৯১-তে একটি অন্যটি ৯২ সালের ১৬ জুন। এগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের অসন্তোষ দস্তুর মতো জানান দিলেও সরকার তা গ্রাহ্য করার প্রয়োজন মনে করি নি। অথচ শ্রমজীবী মানুষ, তথা, সমস্ত মেহনতিদের আজ জীবন জীবিকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে, কেননা তাদের উপরেই গোটা আক্রমণ কেন্দ্রীভূত।

স্যার, এই পরিস্থিতিতে, যে সরকার আমাদের এই সংবিধানের মূল নীতিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছেন, সেই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা, যার আমরা এই সংভিদানের নামে শপথ নিয়েছি, তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। এক বাধ্যতামূলক দায়। যেভাবে এ সরকার দেশটাকে পরিচালিত করে চলেছেন সেটা এক তাজ্জব পদ্ধতি। দু'বছরের শাসনকালের মধ্যে শ্রী নরসিম্হা রাও ও তার সরকার আমাদের এই সুবিশাল দেশ ও দেশবাসীকে সমূহ সর্বনাশের কিনারায় এনে হাজির করেছেন।

স্যার, প্রথমে আমরা যদি অর্থনীতির দিকটা দেখি তাহলে কী দেখতে পাই আমরা?

বছর দুয়েক আগে আই.এম.এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশমতো সরকার আর্থিক ও শিল্পনীতি গ্রহণ করেচেন। বাস্তবে প্রাগুক্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আড়কাঠিদের দ্বারাই এই দুই নীতি নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত দুই বিদেশী সংস্থার দ্বারা নির্ধারি ও নির্দেশিত নীতিগুলি আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যার ফলে আমাদের স্ব-নির্ভর অর্থনীতির বনিয়াদটাই সঙ্কটে পড়েছে।

যে শিল্পনীতি এখন রূপায়িত হচ্ছে, আমাদের দেশীয় শিল্পগুলির উপর তার প্রভাব খুবই ক্ষতিকারক। সরকার আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে। ভেঙে

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

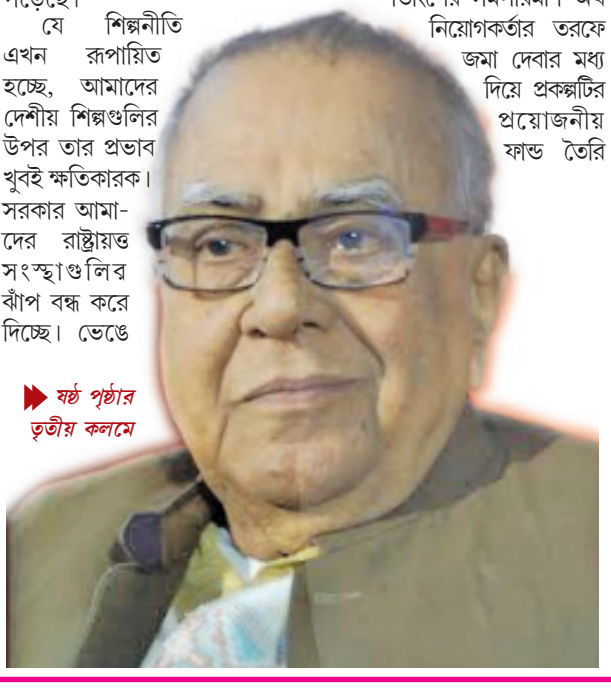

পেনশন বিলের বিরোধিতায় শ্রমজীবী স্বার্থে ভাষণ

নয়া পেনশন বিল যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি করেনি। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন কংগ্রেস (আই) শ্রমমন্ত্রী পি.এ. সাংমা রাজ্যসভায় বিলটি প্রথম উত্থাপন করেন। সেই সময় বামপন্থী সাংসদদের তীব্র প্রতিবাদে কংগ্রেস আর এগোয়নি। বিভিন্ন পর্যায়ে এমনকি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনা চূড়ান্ত হবার আগেই অকস্মাৎ ১৯৯৫ সালের ১৭ অক্টোবর তৎকালীন কংগ্রেস(ই) সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে ১৬ নভেম্বর '৯৫ থেকে পেনশন প্রকল্প চালু করে। সেই সময় থেকেই সংসদের অভ্যন্তরে এবং সারা দেশে পেনশন বিলের বিরুদ্ধে সিটুর নেতৃত্বে জোরদার শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। নির্বাচনের মুখে এটিকে শ্রমিকস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অপপ্রচার এবং অর্ডিন্যান্সটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। পেনশন বিলটি পরামর্শদাতা কমিটিতে যায়। অবশেষে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি স্থান পায়। সিআইটিইউ-র পক্ষে সিপিআই(এম) সাংসদরা সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলটির বিরোধিতা করে। তারা বলে, শ্রমিকেরা যেখানে পেনশনকে তৃতীয় সুবিধার দাবি জানাচ্ছে, সেখানে সরকার শ্রমিকদের অর্থ দিয়েই তাদের কল্যাণে নেমেছে। ঐক্যমত্যের স্বার্থে সিপিআই(এম) সাংসদরা পেনশন প্রকল্পটিকে ঐচ্ছিক (optional) করার প্রস্তাব দেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ২২ জুলাই '৯৬ শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং বি এম এস-এর মতো চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন চলতি অধিবেশনেই বিলটি পাশ করানোর দাবি জানিয়ে সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের চিঠি দেয়। ৩১ জুলাই রাজ্যসভায় সি.পি.আই(এম) সাংসদদের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ৫১-১৩ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। লোকসভাতেও বিলটি ২ আগস্ট সি.পি.আই(এম), আর. এস. পি সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ৬৭-৩৩ ভোটে গৃহীত হয়। এখানে গত ২ আগস্ট '৯৬ সাংসদ অজয় মুখোপাধ্যায় পেনশন বিলের বিরোধিতা করে লোকসভায় যে ভাষণ দেন তার পূর্ণ বয়ান মুদ্রিত হলো।

সভাপতি মহাশয়,

'কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে ভারত সরকার 'পেনশন স্কিম' চালু করতে চেয়ে এই বিল এনেছেন।

এ কাজটি কিন্তু অতীতেই সারা হয়েছে। বিগত সরকার লোকসভার মতামতের জন্য অপেক্ষা করেনি। অর্ডিন্যান্স এনে গত ১৬ নভেম্বর, '৯৫ থেকে তারা এটিকে কার্যকর করে দিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, জবরদস্তি চালু করা এই অতীতে কাজের দায় বর্তেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর। বৈধ অভিভাবক না হয়েও অন্যের শিশুকে পালন করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রকল্পটি সম্পর্কে নতুন করে ভাবলে আমি সুখী হতাম।

এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে 'পেনশন প্রকল্প'-র বিভিন্ন ধারা নিয়ে প্রবল আপত্তি জানাতে চাই। নতুন স্কিম-এর আওতায় এসে শ্রমিকদের বর্তমান সুযোগ-সুবিধার কোনো অগ্রগতি ঘটবে না। বরং এটি কার্যকর হলে তাদের স্বার্থহানিই ঘটবে। বলা হয়েছে শ্রমিকদের মজুরির ৮.৩৩ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ নিয়োগকর্তার তরফে জমা দেবার মধ্য দিয়ে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় ফান্ড তৈরি হবে। এভাবে শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে (প্রভিডেন্ট ফান্ড) নিয়োগকর্তার দেয় মজুরির ৮.৩৩ শতাংশ সরিয়ে প্রকল্পটির ফান্ড তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যনিধি প্রকল্প-র প্রায় অর্ধেক অর্থ বাজেয়াপ্ত করেই পেনশন প্রকল্প চালু হচ্ছে। এক্ষেত্রে এতো হিসেবনিকেশের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পাটিগণিতে সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিও সহজেই বুঝবেন যে, মূল অর্থ হিসেবে নিয়োগকর্তার দেয় উক্ত অংশ আর এর উপর ১২ শতাংশ হারে প্রাপ্য সুদ শ্রমিকরা কোনোদিনই হাতে পাবেন না।

সভাপতি মহাশয়, লাভের কথা বলে লাভ নেই। এতে ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়াবে বিশাল পরিমাণ। প্রসঙ্গত, শ্রমিকদের এই 'কনট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড'-এর অনেকটাই ব্যবহৃত হয়েছে সরকারী প্রচারের কাজে। এতে বলা হয়েছে দেশের শ্রমজীবীরা বহুল পরিমাণে উপকৃত হবেন। কতটা উপকৃত হবেন তা শ্রমিকরাই ভালো জানেন।

এ কথাও প্রচারিত হয়েছে যে, দেশের শ্রমিকশ্রেণী প্রকল্পটি চালু করার জন্য দীর্গদিন সংগ্রাম করেচেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র কী? এটা ঠিক, মেহনতীরা তৃতীয় সুবিধা (থার্ড বেনিফিট) হিসেবে পেনশনের দাবী জানিয়ে লড়াই আন্দোলন করছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে কোনো অতিরিক্ত সুবিধা দেবার পরিবর্তে বর্তমানে চালু থাকা দ্বিতীয় সুযোগকেই ছাঁটাই করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে অর্জিত সাফল্য কার্যত কেড়ে নেওয়া হলো। ভবিষ্যনিধি প্রকল্প শ্রমিকদের সম্পদ, বলপ্রয়োগে সরকার বাহাদুর তার অর্ধেকটাই আত্মসাৎ করছেন শ্রমিকদের সাথে কোনো আলোচনা না করেই।

ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানাবার কোনো অবকাশ এতে নেই। এটা অন্যায়, অনৈতিক। এটা ঠিক যে, চাকুরীর শুরুতে যেসব কর্মীর মৃত্যু ঘটবে বা শারীরিকভাবে যাঁরা প্রতিবন্ধী হবেন, এই প্রকল্পে নিশ্চিতভাবে তারাই উপকৃত হবেন। কিন্তু প্রকল্পটি তো মৃত্যুকালীন সুযোগ নয়। এটি কার্যত অবসরকালীন সুযোগ। পারিবারিক পেনশন প্রকল্প তো চালুই ছিল। কেন তা ভেঠে পড়ল? সেক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়ের অনুপাত ছিল ১০ ঃ ১। এক কথায় ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের ১০ ভাগ কম ছিল। এর ফলে কি ধরে নিতে হবে যে, মৃত শ্রমিকদের পরিবার পারিবারিক পেনশনের দরুণ পাওয়া-গণ্ডা পায় নি?

পেনশন প্রকল্প পেশ করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পারিবারিক পেনশন স্কিম-এ অনেক কিছুরই অভাব ছিল। তার ফলেই আলোচ্য প্রকল্পের অবতারণা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, চালু থাকা 'কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড' বাতিল না করে পারিবারিক পেনশন স্কিম সংশোধনের করা হলো না কেন? এই কাজটা অনায়াসেই সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু আপনারা এটি করলেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার জনগণকে বোঝাতে চাইছেন যে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এর ফলে উপকৃত হবেন। এটা কি অতিশয়োক্তি নয়? বলা হচ্ছে, ঐতিহ্যগতভাবে যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এর ফলে উপকৃত হবেন। এটা কি অতিশয়োক্তি নয়? বলা হচ্ছে, ঐতিহ্যগতভাবে যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, তারা কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পের আওতায় আসবেন। কিন্তু কীভাবে? এটা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত এই অনিয়মিত ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কী হবে? কেনই বা তারা উপকৃত হলেন না? তাদের মজুরির বার্ষিক বৃদ্ধির হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ মাত্র। রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ কালে প্রকল্পের

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আমাদের অজয়দা

মলয় রায়
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

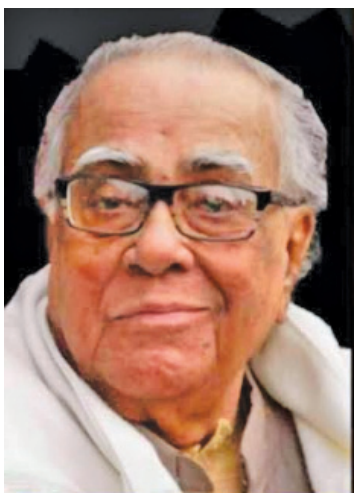

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে, ১৯৬১ বা '৬২ হবে, কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়, আমাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় অজয়দাকে প্রথম দেখি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি কর্মচারী সমাবেশে। অজয়দা সেই সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। আমি তখন একেবারেই নবীন কর্মচারী, কর্মচারী আন্দোলনে একজন আনকোরা কর্মী। ঐ সভার আগে অজয়দার নাম শনুলেও, তেমন কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সেদিন কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত নেতিবাচক মনোভাবের বিরুদ্ধে অজয়দার জোরালো বক্তব্য মনে দাগ কেটেছিল। কণ্ঠস্বর, উপস্থাপনা, শব্দচয়ন এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর ব্যখ্যা—সব মিলিয়ে আমার মতো একজন নবীন কর্মচারীকে উৎসাহিত করেছিল। কর্মজীবনের প্রথম দিকে আমার কর্মী সত্ত্বার বিকাশ। ধীরে ধীরে কিছুটা সংগঠক ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন—সবকিছুরই কেন্দ্র ছিল তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। কারণ ১৯৬৫ সালে আমি ঐ জেলায় বদলি হয়ে যাই। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যাবার আগে অজয়দার সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেনি। তাঁকে কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগও পাইনি। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় তখনও আমার কাছে, কিছুটা দূর থেকে দেখা একজন নেতা। অজয়দাও তখন মূলত সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন দারুণ সম্ভাবনাময় সংগঠক, যিনি খুব দ্রুত সামনের সারিতে উঠে আসছেন।

পশ্চিম দিনাজপুর বদলি হয়ে যাওয়ার আগে, কলকাতায় আমার পোস্টিং ছিল নিউ সেক্রেটারিয়েটে। ঐ নিউ সেক্রেটারিয়েটের গেটেই অজয়দার বক্তব্য দ্বিতীয়বার শুনি ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যৌথ মিছিলের শুরুতে। একইরকম আবেগমোহিত প্রণোদনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য। তাঁর এই বক্তব্য শুনে সহকর্মীদের কাছে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল—'নেতা হো তো এ্যায়সা'।

কলকাতায় থাকতে থাকতেই ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী হিসেবে সংগঠনের টুকিটাকি কাজ করতাম। এর মধ্যে একটা ছিল পোস্টার লেখা। বউবাজারে ১৮৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের যে বাড়িতে তখন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর, সেখানেই তিনতলার একটি ঘর ডাইরেক্টরেট ও সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ভাগাভাগি করে ব্যবহার করত। ঐ ঘরে বসেই আমরা পোস্টার লিখতাম। অজয়দা কো-অর্ডিনেশনের নেতা হিসেবে অরবিন্দদা, নরেনদা, শ্যামদাদের মতো প্রায়ই ঐ বাড়িতে আসতেন। আবার যেহেতু তিনি তখন সম্ভবত সেক্রেটারিয়েট সমিতির সাধারণ সম্পাদক, তাই আমরা যে ঘরে বসতাম, পোস্টার লিখতাম, সেখানে বসেও খানিকক্ষন সময় কাটাতেন। কথা বলতেন আমাদের সাথে। ঐ ঘরেই অজয়দার সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রপাত। তখনই দেখেছি, সাংগঠনিক পদমর্যাদায় আমাদের থেকে অনেকটা ওপরে হলেও, সকলেরই পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর নিতেন। পোস্টার লেখার একদিনের একটা ঘটনা না উল্লেখ করলেই নয়। অবশ্য উল্লেখ করতে হবে ভূমিকাসহ। সেই সময় সংগঠন সবে গড়ে উঠছে। সংগঠনের তহবিলও খুব দুর্বল। পাশাপাশি কর্মচারীদের আর্থিক দূরবস্থাও তখন একটা স্থায়ী বিষয়। যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই লড়াই চলছিল। স্বভাবতই কি সাংগঠনিক কি ব্যক্তিগত—কোনদিক থেকেই অপচয় করার কোনো সুযোগ ছিল না। যেদিন আমরা কয়েকজন পোস্টার লিখছিলাম। অজয়দাও উপস্থিত ছিলেন, দেখছিলেন। একটা পোস্টার লিখতে গিয়ে আমার একটা ভুল হয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম কাগজটা ফেলেই দেব। কিন্তু অজয়দা ফেলতে দিলেন না। বললেন, দাঁড়াও মেক-আপ করে দিচ্ছি। সত্যি সত্যিই দারুণ মেক-আপ করলেন। পোস্টারটাও দাঁড়িয়ে গেল, কাগজও নষ্ট হলো না।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর- ডিসেম্বরে পরিবার নিয়ে পারি দিই পশ্চিম দিনাজপুরে। জেলায় গিয়ে পুরোদমে শুরু করি সংগঠনের কাজ। ফলে একসময় জেলার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য হলাম। কাউন্সিল সভার জন্য কলকাতায় এসে অজয়দার সাথে স্বাভাবিকভাবেই দেখা হতো। ততদিনে সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তখন থেকেই অজয়দা যে কোনো কারণেই হোক আমার সাথে বহু বিষয়ে কথা বলতেন। এমনকি ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিষয়গুলিও। বয়সে আমি অনেকটাই ছোটো হলেও, অজয়দাই তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে অজয়দা, অরবিন্দদা সুকোমলদা জেলা সফরে গেলে প্রায়শই আমার বাড়িতেই উঠতেন। যেখানে খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমার দু-কামরার ছোট ভাড়া বাড়ির একটা ঘরে তাঁরা আমাদের সাথে মিটিংও করতেন। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়। একটি বিষয় সাংগঠনিক, দ্বিতীয়টি নিতান্তই ব্যক্তিগত। সাংগঠনিক বিষয়টি হলো, অজয়দা বা সুকোমলদা যেহেতু শুরুতে কলকাতা ভিত্তিক সমিতির নেতা ছিলেন, তাই জেলায় তাঁদের তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না। জেলার কর্মচারীরা মূলত চিনতেন অরবিন্দদাকে এবং আরো একজনকে যিনি অবশ্য পরবর্তীকালে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন (অমল গাঙ্গুলী)। অজয়দা এবং সুকোমলদা কিন্তু তাদের সাংগঠনিক প্রজ্ঞা দিয়ে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা সমস্ত জেলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বলতে বাধা নেই এই কাজে সুকোমলদার থেকেও অনেকটা এগিয়ে ছিলেন অজয় দা। সম্ভবত অজয়দার বাগ্মীতা ছিল তাঁর অতিরিক্ত প্লাস পয়েন্ট। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অজয়দা ছিলেন খাদ্যরসিক। ফলে অজয়দা আমাদের বাড়িতে গেলেই, আমার স্ত্রী তাঁকে যত্ন করে রান্না করে খাওয়াতেন। অজয়দার পছন্দের পদও আমার স্ত্রী জানতো। একদিন আমার স্ত্রী'র রান্না অজয়দার এতটাই ভালো লেগেছিল যে আমার স্ত্রীও বিপদে পড়ে গেছিল। মানে খাদ্য রসিক অজয়দার সামনে

▶▶ সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১২ই জুলাই কমিটির ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটির ৫৩-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান বিগত ১৬ জুলাই ২০১৯ মঙ্গলবার কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "ভারত কোন পথে", আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বিজেপি দ্বিতীয়বার কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর সারা দেশের সামনে কী ধরনের বিপদ দেখা দিয়েছে এবং কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা বামপন্থীদের করতে হবে তার বিশ্লেষণ করে মানিক সরকার বলেন, জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপরে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরে এবং মানুষের নাগরিক অধিকারগুলির ওপরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আরো তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনবে। কিন্তু আক্রান্ত হলেও বামপন্থীদের পিছিয়ে যাওয়ার কোনো

'ভারত কোন্ পথে' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

প্রশ্নই নেই, বরং আরো তীব্রভাবে প্রতি আক্রমণে যেতে হবে বামপন্থীদের। বিজেপির প্রতি যে ঘোর মানুষের মনে তৈরি হয়েছে তা বেশিদিন থাকবে না, পেটে পিঠে টান পড়লেই জনগণ সম্বিৎ ফিরে পাবেন। তাই মানুষের ওপরে আস্থা রেখে তাঁদের স্বার্থরক্ষায় লড়াইয়ের মাঠে থাকতে হবে বামপন্থী কর্মী নেতৃত্বদের। লড়াই-আন্দোলনের রাস্তায় প্রতিনিয়ত থাকার মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রকৃত শত্রু মিত্র চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত ১২ই জুলাই কমিটির ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। সভা পরিচালনা করেন সমীর ভট্টাচার্য, অনুপ চক্রবর্তী, প্রিয় নিয়োগী ও বিজয়শঙ্কর সিংহকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে একটি শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এছাড়া জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের কঠোর সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য এবং তার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় এই প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

এদিনের সভার মূল আলোচক ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাতে পুষ্পস্তবক ও ১২ই জুলাই কমিটির ইতিহাস শীর্ষক একটি পুস্তক স্মারক হিসেবে তুলে দেন যুগ্ম আহ্বায়কগণ।

বক্তব্যের শুরুতে মানিক সরকার বলেন বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল গণআন্দোলনের পরিস্থিতিতে ১২ই জুলাই কমিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংগঠনের বিকাশের প্রশ্নে কমরেড কে জি বসু এবং কমরেড অরবিন্দ ঘোষের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে আর এস এস পরিচালিত বিজেপির বিপুল জয় ও সেখান থেকে উদ্ভূত চারটি বিপদের উল্লেখ করেন। এগুলি হলো নব্য উদারনীতির আক্রমণ, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। দলিত আদিবাসী ও মহিলা সমাজের উপর আক্রমণের আশঙ্কা, সাংবিধানিক ও স্বাধীন সংস্থাগুলি দখল করে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ভারতকে 'নিরাপদ রাষ্ট্রে' পরিণত করতে সমগ্র বিরোধী মতকে নস্যাৎ করা—এই বিপদ সৃষ্টি হয়েচে। তাই একে মোকাবিলা করতে জনগণের জীবন জীবিকার চাহিদাগুলিকে সামনে রেখে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে একদিকে যেমন, বিজেপি কর্পোরেটদের মদতে একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আবেগ ও সাম্প্রদায়িকতার মিশেলকে ব্যবহার করে জনজীবনের প্রকৃত বিষয়গুলিকে পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য জয়লাভ করে আরো পাঁচ বছরের জন্য শাসনক্ষমতায় অসীন হয় অপরদিকে এবারের নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলিরও ক্ষমতা ও প্রভাব কমেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে বড় দল বিজেপি বিরোধীদের এক জায়গায় এনে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপিও তার সাম্প্রদায়িক নীতিকে পরাস্ত করার কথা বলেছিল তারাও তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। ফলে দেশের মানুষের সামনে, বামপন্থী শ্রমজীবী মানুষের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে। বামপন্থীদের ক্ষমতা হ্রাস হলেও আমরা লড়াইয়ের মাঠ ছাড়ব না। জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বামপন্থীরা লড়াইয়ের ময়দানেই থাকবেন এবং বিজেপির গণতন্ত্র বিরোধী চেহারাকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরা হবেই। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় বামপন্থীদের নিজেদের কোমরের জোর বাড়াতে হবে। শুধু একে ধরে, তাকে ধরে কতটা কী করা যায় এমন চিন্তাভাবনা রাখলে চলবে না। শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই। গাছে উঠতে গেলে গাছে ওঠা শিখতে হবে। উঠতে গিয়ে একটু চোট, আঘাত লাগবে। হাতেও লাগতে পারে, পায়ের আঙ্গুলেও লাগতে পারে। কিন্তু কারোর ঘাড়ে চেপে যদি গাছে উঠি, আর তিনি যদি তলা থেকে চলে যান , নামবো কী করে? নামা যাবে না তো, তাই নিজের পায়ে, নিজের কোমরের জোরেই উঠতে হবে।

ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করে তিনি বলেন গত বিধানসভা ভোটের পর থেকে সেখানে বামপন্থীরা আক্রান্ত। লুটপাট, বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিস দখল, অগ্নিসংযোগ, বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া এসবই সেখানে ঘটছে। বিরোধীদের চাষের কাজ, গাড়ি চালানো বন্ধ করার মধ্য দিয়ে রুটি-রুজির ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এরই মধ্যে লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনে ভোট লুট করে জয়ী হয়েছে। ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। জেতার পরেও জনমতকে ভয় পাচ্ছে বলেই পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর নির্বাচনে ৮৬ শতাংশ আসনে বিরোধীদের কোনো মনোনয়ন জমা দিতে হয়নি বর্তমান শাসক দল বিজেপি। বিরোধীদের ঘরে ঘরে হামলা করে মনোনয়নে বাধা দেয়া হয়েছে। ত্রিপুরাকে গণতন্ত্র হত্যার ল্যাবরেটরিতে পরিণত করেছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মানিক সরকার বলেন, কুমির তাড়াতে গিয়ে হাঙর ডেকে আনবেন না। বামপন্থীদের কোনো বিকল্প নেই তাই বামপন্থীদের শক্তিকে সংহত করাই এই সময়ের প্রধান কর্তব্য। □

সম্পাদকীয় (সংগ্রামী হাতিয়ার, ৭ মে ১৯৭১)

আজ সারা পশ্চিমবাংলায় এক আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য শাসকশ্রেণী মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে লক্ষ কোটি মেহনতী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য। কিন্তু পারছে না। মেহনতী মানুষের বুক থেকে ঝরানো রক্তস্রোত ব্যার্থ হচ্ছে না, হতে পারে না। ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, অফিসে-দপ্তরে, পাড়ায়-পাড়ায় এগিয়ে আসছে মানুষ সীমাহীন ঘৃণা আর জ্বলন্ত বিক্ষোভ বুকে নিয়ে—শহীদের রক্তে কঠিন সংগ্রামের দৃপ্ত পথ উচ্চারিত হচ্ছে দিকে দিকে। কিন্তু শাসকশ্রেণী ও তার তল্পিবাহকেরা পশ্চিমবাংলায় সেই খেটে-খাওয়া মানুষকে এনে দাঁড় করিয়েছে ১৪৪ ধারা-কার্ফু দিয়ে ঘেরা পুলিশ-মিলিটারি, সি.আর.পি-র উদ্যত সঙ্গীনের মুখোমুখি। তার পিছনে লুকিয়ে আছে গুপ্তঘাতকের দল তাদের ছোরা-বোমা-পিস্তল নিয়ে।

কঠিন লড়াই লড়বে মানুষ। লড়বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। কারণ তাদের বাঁচতে হবে—ছিনিয়ে আনতে হবে সুখী সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎকে। ওপার বাংলার রক্তে ভেজা মাটিতে সাড়ে সাত কোটি স্বাধীনতাকামী মানুষের হিংস্র জঙ্গী বর্বরতার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই নতুন সাহস সঞ্চারিত করেছে শ্রেণীসংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ এপার বাংলার মানুষের মনে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সুকঠিন লড়াইকে সংগঠিত করার ও এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'সংগ্রামী হাতিয়ার'—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাসিক মুখপত্র। মে দিবসের সংগ্রামী আহ্বান শ্রেণী সংগ্রামের শাণিত প্রতিজ্ঞা আর দু'লক্ষ কর্মচারীর নতুন পর্যায়ের আন্দোলনের বলিষ্ঠ আহ্বান বুকে নিয়ে শুরু হলো বন্ধুর পথে এর যাত্রা। □

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

(অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর লেখা প্রথম সম্পাদকীয়টি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো)।

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

শ্রমজীবী স্বার্থে ভাষণ

রূপকাররা বলেছেন, মজুরিবৃদ্ধির বার্ষিক হার দশ শতাংশের কম হবে না। এটা ধরে নিয়েই স্কিমটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কার্যত এটি জাতীয় হার। কিন্তু বিড়ি শিল্পের শ্রমিক, চুক্তিবদ্ধ ঠিকা শ্রমিক, নির্মাণকর্মী কিংবা অনিয়মিতভাবে যারা মাসে থোক বেতন পান, তারা কি এর ফলে উপকৃত হবেন? অথচ, রূপকারদের ধারণা তারা উপকৃত হচ্ছেনই। দুর্ভাগ্য যে, দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী, বিশেষত, মাসিক আয় যাদের পাঁচ হাজার টাকার বেশি, তাদের বিরুদ্ধে হিসেব কষেই প্রচার চালানো হচ্ছে।

সভাপতি মহাশয়, এদেরকে কী উচ্চবেতনভোগী আখ্যায়িত করা যাবে? কারখানার আধা দক্ষ-কর্মী কিংবা সরকারী দপ্তরের উচ্চবর্গীয় করণিকরা অনেকেই মুদ্রাস্ফীতির যুগে আজ পাঁচ হাজার টাকার বেশি বেতন পাচ্ছেন। বেতনের পরিবাণ পাঁচ হাজার টাকার বেশি হলে এর উপর অতিরিক্ত অর্থ পেনশনের আওতায় আসবে না। উক্ত সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক বৈকি! সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরাই গোটা দেশের কর্মীবাহিনীর মেরুদণ্ড একথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন? এটা কি তাঁদের অপরাধ? লড়াই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অর্জিত মজুরিবৃদ্ধির জন্য কি তাঁরা দায়ী? এর জন্য শাস্তি কি তাঁদের প্রাপ্য? তাছাড়া কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের হালই বা কী?

একজন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণকালে পেনশন পাবার যোগ্য হয়ে ওঠেন, পেয়েও থাকেন অবসরের সাথে সাথেই। কিন্তু এই প্রকল্প অনুসারে ৪০ বছর বয়সে অবসর নিলেও পেনশন পেতে একজন কর্মীকে আরো ১৮ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সুদীর্ঘ ১৮ বছরের প্রতীক্ষা! সরকারের শিল্পনীতিকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। অর্থমন্ত্রী মহোদয়, প্রকল্পে এ কথাই বলা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম ঃ ৪০ বছর বয়সে একজন কর্মী কেন অবসর নেবেন? বাস্তবজীবনের তো এমনটি ঘটে না। **অজয় মুখোপাধ্যায় ঃ** হাজার হাজার শ্রমিক ৪০ বছরেই অবসর নিচ্ছেন, আপনি অন্য কিছু বলতে পারেন, তবে এটাই বাস্তব। বিড়ি শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কী ঘটে? কীই-বা ঘটে থাকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা নির্মাণ কর্মীদের ক্ষেত্রে? তাঁরা হারিয়ে যান জনগণের ভিড়েই। তাঁদের চাকুরীকাল ২০ থেকে ২৫ বছর মাত্র। আর পেনশন পেতে ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের অপক্ষো করতে হবে। এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? আর আপনি ভাবছেন এই প্রকল্প উপযোগী হবে। প্রকল্পের ২৬-তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকারের তহবিলে ৮.৫ শতাংশ হারে পেনশন ফান্ডজনিত প্রাপ্য অর্থ বাবদ বিনিয়োগ করা হবে। সুদের হার যখন ১২ শতাংশ পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে সুবিধা কোথায়? কিভাবেই বা এই তহবিল ব্যবহৃত হবে? সরকার ঐ অর্থের ব্যবহার করবেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। শ্রমিকদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ কিনা ব্যয় করা হবে অন্য খাতে।

সভাপতি মহাশয়, এই বিলে সম্মতি দেওয়া কি সম্ভব? এসব বাদ দিয়েও দেখা যাবে তহবিলের ৩ শতাংশ প্রাশাসনিক কাজে ব্যয় করা হবে। সেক্ষেত্রে সুদের হার ৮.৫ শতাংশ থাকবে না, এই হার আরো হ্রাস পাবে।

মহাশয়, আমি ব্যথিত যে, অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এই প্রকল্প সমর্থন করেছেন। মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ আবার প্রকল্পটিকে উল্লেখযোগ্য বলেছেন। এত গুণ সমন্বিত স্কিমটি সম্পর্কে সদস্যরা কেনই বা আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন আর এ সম্পর্কে শ্রমিকদের কাছে মতামত নেবার সুযোগ করে দিতে বাধা দিচ্ছেন? আশঙ্কা ব্যক্ত করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকল্পটি যদি প্রকৃত অর্থে শ্রমিকদের স্বার্থবাহী হয়েই থাকে, তাহলে তো তারা এতে সম্মতিই দেবেন। আপনারা এভাবে শ্রমিকদের অর্জিত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন না। তাঁদের কোনোরকম 'অপশন'-এর সুযোগ না দিয়ে, কোনো মতামত না নিয়ে, তাঁদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের অর্ধেক টাকা আপনারা ছিনিয়ে নিতে পারেন না। সভাপতি মহোদয়, আপনার কাছে বিশেষ আবেদন রেখে আর দলমতের উর্ধ্বে উঠে এই কক্ষের সব সদস্যকে আহ্বান জানিয়ে বলি, বিলটি সম্পর্কে আর একবার ভাবুন। দেশের শ্রমজীবীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। যাঁদের অক্লান্ত শ্রম আর সীমাহীন আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন আর আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হতো না, তাঁদের নিয়ে খেলবেন না। অনুরোধ জানাই, বিষয়টি আর একবার ভেবে দেখুন। প্রকল্পটিতে শ্রমিকদের মতামত দেবার সুযোগ করে দেয়ার উপরই আমি জোর দিতে চাই। অন্যথায় এটি হবে শ্রমজীবী, সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে

গুড়িয়ে দিচ্ছেন এগুলো। সরকারের এই কাজ শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী বা জনবিরোধীই নয়, জাতীয় স্বার্থ বিরোধীও বটে।

৪৬ বছরের স্বাধীনতার পর এদেশের শ্রমিকশ্রেণী এমন নীতি যৌতুক পেলেন যার নাম—'একজিট পলিসি' বা বিদায় নীতি। এই হলে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার। শুধু শিল্পেই নয়, ডাঙ্কেল প্রস্তাব মেনে নেবার মধ্য দিয়ে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছে অনুপ্রবেশের নয়া এলাকা খুলে যাবে, বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্রে। মুদ্রাস্ফীতিকে নামিয়ে আনার বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও মানুষ দুর্দশায় জর্জরিত। মুদ্রাস্ফীতি কমেছে অথচ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিনা তার বিপরীত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু বিলাসপণ্য, যেমন, রঙিন টিভি, বাতানুকূল যন্ত্র, প্রসাধনী সামগ্রী ও অন্যান্যের দাম কমছে।

দু'বছর আগে এই অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলাফল কি মিলেছে? মূল্যমানের ক্ষেত্রে এটা সামগ্রিকভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। শিল্পক্ষেত্রেও এই নীতি বিপর্যয়ের কারণ। জমা বিপুল বৈদেশিক ঋণের বোঝা আরো বৃদ্ধির জন্য রাও সরকার এখন আবার আই. এম. এফ-এর ৯ বিলিয়ন ডলারের একপ্রস্থ ঋণের জন্য আলোচনা চালাচ্ছেন। দিল্লীতেই ওদের (আই. এম. এফ-এর) লোকেরা রয়েছে। আপনারা (প্রধানমন্ত্রী) তাদের কাছে নতুন কিস্তির ঋণের জন্য উমেদারি করচেন। হিসেবে দেখা গেছে যে, এই নয়া ঋণের দায় বাবদ (ডেট সার্ভিসিং) প্রতি বছর অন্যূন ৬০০০ কোটি টাকা আমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে।

আর উদারীকরণ নীতিটাই বা কী? তজ্জনিত আঘাতটা বা কতখানি? এই উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসেবে মুদ্রা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কুৎসিত দুর্নীতির কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে। এই নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো ৫ হাজার কোটি টাকা বা তদনুরূপ পরিমাণের শেয়ার কেলেঙ্কারি। শেয়ার বাজারে লাগামছাড়া ফাটকাবাজি খোলাখুলি জবরদস্ত উৎসাহিত করেছে এই সরকার। আমাদের পণ্ডিতপ্রবর অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এখানেই রয়েছেন। তিনি ১৯৯২-এর বাজেট অধিবেশনে শেয়ার বাজারের তুরীয় অবস্থাকে তাঁর অর্থনীতির সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেচিলেন। আর্থনীতিক ভ্রান্তিগুলির উৎকৃষ্ট ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক যোগসাজশে দুর্নীতিগ্রস্ত দালাল ও আমলাচক্রের সরকারী তহবিল তছরূপ। প্রকৃতপক্ষে সরকার জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তারা রাষ্ট্র অধিগৃহীত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করচেন। বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের সম্পদের লুঠতরাজ চলছে। সমস্ত নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে দালাল এবং মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলির কাছে লাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এটা শুধু আমাদের বা আমার তরফের বক্তব্য নয়, ৯১-৯২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম রাউন্ডের শেয়ার বিক্রির প্রসঙ্গে সি. এ. জি-র মন্তব্যে দেখা যাবে সরকারের লোকসান ঘটেছে ৩০০০ কোটি টাকা। এই লোকসান শুধু সরকারের নয়, গোটা জাতির, সমগ্র দেশের। এতদ্সত্ত্বেও, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আরো শেয়ার বিক্রির পথে সরকার এগিয়েই চলেচেন। জনগণের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ তারা বেঁচে চলেছেন আর জন্য কোনো নিয়মকানুনের ধার ধারছেন না।

আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয় এটা। এই নীতির গর্ভ থেকে দুর্নীতির কেলেঙ্কারি স্রোতধারার মতো বেরিয়ে আসছে। বহু কেলেঙ্কারির ঘটনাই এর মধ্যে রয়েছে, আমি তার সবগুলি উল্লেখ করতে চাইছি না। উনি (প্রধানমন্ত্রী) সবই জানেন। শেষমেশ যেটা বলবো—তলিয়ে যাওয়া বোফর্স আবার ভেসে উঠেছে, তার সাথেই দৃশ্যমান হচ্ছে এর পেছনের ইতালীয় ব্যক্তি-সম্পর্ক। সুতরাং ভবিষ্যতেও মানুষের বলার মতো অনেক কিছু বেরুবে। আর এটাই হচ্ছে আপনাদের নতীর নির্যাস। এটা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেই দেখুন, সরকার কী করছে আর কী-ই বা তাদের লক্ষ্য। অযোজ্য নিয়ে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করা হলো আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরসিমহা রাও গত ছ'মাস ধরে হিন্দু ধর্মীয় গুরুদের মন জয় করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, যাতে তারা মন্দির নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত ট্রাস্টে অংশ নেন। এখন এটা খুবই পরিষ্কার যে বিজেপি-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর. এস. এস বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এবং তাদের রামমন্দির নির্মাণের মঞ্চটাকে দখল করার লক্ষ্যেই ছিল এই প্রয়াস। এটা কী ধর্মনিরপেক্ষতা? আমাদের সংবিধানে বিধৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষার প্রয়াস নিতে কি আপনারা আদৌ আন্তরিক? বুঝে দেখুন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড শেষপর্যন্ত বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িক মঞ্চের বৈধতা প্রদান ও যৌক্তিকতা প্রমাণেণই পর্যবসিত হবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। অযোধ্যাপ্রকল্প এবং হিন্দু সাম্পরদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে শ্রী নরসিমহা রাওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিমূলে মর্মান্তিক আঘাত। আর আমরা এ যাবৎ যা কিছু গৌরব অর্জন করেছি তা ধূলিসাৎ হবে।

স্যার, এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ হলো সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও যে প্রক্রিয়ায় আপনি চার শঙ্করাচার্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ছেন আপনারা এভাবেই। বিজেপি অনুসৃত পথের পথিক আপনারাও। তাদের সঙ্গে আপনারা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। শুধু তাই নয়, আপনারা এমনকি তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত।

স্যার যে পথে এই সরকার লছে তাতে দেশের সমূহ সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হবার নয়। সুতরাং এই মহান সভার পবিত্র কর্তব্য ও সভার সদস্যদের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব হলো অবিলম্বে এই সরকারের পতন ঘটানো। নতুবা যদি এই সরকারকে জনবিরোধী নীতি চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে আমার জানা নেই এই মহান দেশের ভবিষ্যৎ যে কী হবে। আমি সত্যি বলছি আমার জানা নেই। সেজন্যই সভার সমস্ত সদস্যদের কাছেই আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাঁরা এই অনাস্থাসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন এবং এই সরকারের পতন ঘটানোয় সাহায্য করুন। এ কথা আমি বলছি এ কারণেই যে সরকারের নীতিগুলিকে অবশ্যই পরাস্ত করা প্রয়োজন। এই সরকারেক পরাস্ত করা জরুরি যদি তারা তাদের অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটাতে অস্বীকার করে এবং যদি তারা আমাদের দেশের ও সংভিদানের প্রাণহক্তি ও আমাদের সমস্ত মূল্যবোধকে কুরে খাচ্ছে যে সর্বব্যাপী দুর্নীতি তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে বদ্ধপরিকর না হয়।

সিবিআই কী করে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করবে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সিবিআই-এর দায়িত্বে রয়েছেন। এটা কী করে সম্ভব? যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে বিভাগীয় প্রধান, সেখানে সিবিআই স্বাধীনভাবে তদন্ত চালাতে পারে কি? এসব অভিযোগ যখন নিজের বিরুদ্ধে, তখন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে সরে দাঁড়ানো উচিত ছিল। ফলে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাই বিপন্ন।

প্রত্যাশিত ছিল যে প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন এবং তিনি জে পি সি-র সামনে হাজির হবেন নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণে। কিন্তু তিনি এটা করলেন না। ফলে এই সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। আমাদেরও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আমি সমগ্র সভার কাছে অনুরোধ করবো এই অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য যাতে সম্মিলিত ভাবে যত শীঘ্র সম্ভব সরকারের পতন ঘটাতে পারি।

এই কথা বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য কাউন্সিলের অষ্টম সভা

অবিসংবাদী নেতৃত্ব কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং অষ্টম রাজ্য কাউন্সিল-এ উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। পরবর্তীতে সপ্তম কাউন্সিল সভা থেকে অষ্টম কাউন্সিল সভার মধ্যবর্তী সময়ে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অপর একটি শোকপ্রস্তাব উত্থাপন কর হয় এবং সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।

প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন গত ১৫ জুলাই ২০১৯ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব, চরম উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন ও রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির আসন বৃদ্ধিসহ পরিবর্তীত নজিরবিহীন পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে এই পরিবর্তীত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে (Working Place) একাধিক বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আগামীতে আর্থিক ও অধিকারগত দাবিসহ রাজ্যের উগ্র দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত থাকার লক্ষ্যে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া আসন্ন ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সর্বস্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন ১৭ এপ্রিল ২০১৯ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কর্মীদের নিরাপত্তাসহ পোস্টাল ব্যালট ও ইডিসি-র মাধ্যমে ভোটদান সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনারকে পত্র দেওয়া সহ সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী বিগত ১ মে ২০১৯ কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এছাড়া এই কর্মসূচী জেলা / অঞ্চল ও সমিতিগুলির দপ্তরে প্রতিপালিত হয়। ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু ও বকেয়া ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে

উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যগণ

প্রদানের দাবিতে বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানকে ৭ মে ২০১৯ পত্র দেওয়া সহ রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয় ২৩ মে। ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যেই ২৬ মে বেতন কমিশনের মেয়াদ পুনরায় ৭ মাসের জন্য বৃদ্ধি করার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এর বিরুদ্ধে ২৮ মে ২০১৯ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ সাড়ে তিন বছরের পর আরো ৭ মাস বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে রাজ্যের সর্বত্র দপ্তরে দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৪ জুন ২০১৯ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করা, ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানসহ নেতৃত্বদের অনৈতিক বদলীর আদেশনামা বাতিলের দাবিতে প্রতিটি জেলা সদরে ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলে বিপুল কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে ২ ঘণ্টা ব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী সর্বত্রই প্রতিবাদী মেজাজে প্রতিপালিত হয়। তার আগে ১০ জুন উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেওয়া হয়।

বিগত ২৮ জুন ২০১৯ বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংগঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন আন্দোলনের চাপেই রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে সংগঠনকে ডেকে আলোচনা করতে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমান সময়ের জ্বলন্ত দাবিগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন হরনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক আক্রমণের বিষয়সমূহ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন দপ্তর দখল, স্বাস্থ্য ভবনের বিক্ষোভ চলাকালীন প্রয়াত কাজল ব্যানার্জীর পরিবারের চাকরির বিষয়সমূহ দাবি আকারে পেশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী দাবিগুলি বিবেচনা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ১৯৫৬ সালে পথ চলা শুরুর থেকেই একমাত্র কর্মচারীর স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিধানচন্দ্র রায় থেকে বামফ্রন্ট সরকার হয়ে আজকের সরকার পর্যন্ত কর্মচারী ও জনগণের স্বার্থবাহী পদক্ষেপকে সমর্থন ও এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তার লাগাতার বিরোধিতা করেছে, আগামীতেও করবে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন বিগত সপ্তম কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়েই সদস্যভুক্তির কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২০১৯' কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত কর্মচারীর কাছে পৌছনোর প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদেরকে সঠিক ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। একই সঙ্গে পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তির প্রশ্নে 'এমপ্লয়িজ ফোরাম ও সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর বর্তমান বছরের গ্রাহকভুক্তি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করতে হবে একই সঙ্গে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ১৩ আগস্ট ২০১৯ বকেয়া মহার্ঘভাতা

সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

কাশ্মীরের মানুষ 'ভারত-বিরোধী' সব উগ্রপন্থী ? কাশ্মীরের লোক কি পাকিস্তানে যেতে চায় ?

একেবারেই অসত্য প্রচার। কাশ্মীরের সব মানুষই 'ভারত-বিরোধী', সকলেই উগ্রপন্থী, বিশেষ করে মুসলিম মানেই উগ্রপন্থী, এমন একটা ধারণা মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উগ্রপন্থা থাকলেও আম কাশ্মীরী সকলেই ভারত বিরোধী এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বাজপেয়ী আমলে সামরিক গোয়েন্দাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় যখন কারগিলে ঢুকে পড়েছিল পাকিস্তানের ভাড়াটে সেনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী, সেসময় তা সামনে এনেছিলেন পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ নিয়ে ঘুরে বেরানো বাখরওয়াল মানে কাশ্মীরী মেষ পালকরাই। এমনই এক বাখরওয়ালের আট বছরের মেয়েকে কাঠুয়া দিনের পর দিন ধর্ষণ করে খুন করেছিল বিজেপির নেতা কর্মীরা। আর কারগিলের নিয়ন্ত্রণ রেখায় যখন ভারতীয় সেনা লড়ছিল, তখন তাদের রসদ জোগানোর কাজ করেছিল কিন্তু এই ভারত-বিরোধী কাশ্মীরীরাই। কাশ্মীরের মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির জনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বছরের পর বছর নির্বাচনে তারা ভোট পেয়েছে। কিন্তু তাদের দুর্বল করে বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে।

মিথ্যার যে নির্মাণ বছরের পর বছর ধরে চলেছে, তাতেই জনমনে গেঁথে দেওয়া গেছে, কাশ্মীর চাই, কাশ্মীরীদের নয়।

না, কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তানে গেলে সুফি মতবাদ আর বহুত্ববাদের মিশেলে তৈরি 'কাশ্মীরীয়ৎ'-এর ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। একসাথে ঈদ আর দেওয়ালি পালন করা যাবে না, এমনটা বুঝেই কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে যাওয়ার বিরোধী। তবে ভারতের একের পর এক ভ্রান্ত নীতিই ভারতে থাকতে চাওয়া কাশ্মীরকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কখনো শেখ আবদুল্লাকে জেলে পোরা হয়েছে, কখনো উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত মীরওয়াইজ মহম্মদ ফারুকের শোকযাত্রায় পুলিশ গুলি চালিয়ে মেরে ফেললো ৪৭ জন কাশ্মীরীকে। সঙ্গে চলেছে উপত্যকাজুড়ে ভারী বুটের দাপাদাপি চালিয়ে, আফস্পার মতো দানবীয় আইনের নামে যখন তখন যে কাউকে তুলে নিয়ে গিয়ে, গুলি করে মেরে দিয়ে কাশ্মীরের মনকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ধর্মের বিভাজনরেখা টেনে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করা হয়েছে। সীমান্ত পার থেকে যার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান।

মাঝে মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূরত্ব কমানোর কিছু চেষ্টা হলেও আবার বদলে গেছে পরিস্থিতি। আর মোদির শাসনে গত পাঁচ বছরে আলাপ-আলোচনার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাকে বাড়ানো হয়েছে। আশির দশকে উপত্যকার যে উগ্রপন্থা মূল চালিকা শক্তি ছিল সীমান্তপারের ভাড়াটে সেনা, এই পাঁচ বছরে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিতে মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে লোকাল রিক্রুট। সংবাদমাধ্যমের খবরগুলি ঘেঁটে দেখলেই বোঝা যায়, হিংসার ঘটনা তো ঘটে উপত্যকার মাত্র তিনটি জেলায়। বাকিরা এখনো শান্তি চান। কিন্তু ঘিরে ফেলে তল্লাশির নামে বাহিনীর দাপটে বীতশ্রদ্ধ আম-কাশ্মীরী আজ পাথর ছুঁড়েছে সিকিউরিটি ফোর্সকে লক্ষ্য করে। □

এ কেমন ডিগবাজি !

ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) ও পিওপলস্ ডেমোক্রাটিক পার্টি(পি ডি পি)-র মধ্যে গত ১ মার্চ, ২০১৫ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে জোট সরকার গঠনের পূর্বে)। চুক্তিতে বলা হয়েছে—

'পি ডি পি এবং বি জে পি ''প্রশাসনিক জোট'' ভুক্ত হচ্ছে একটি চুক্তি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে, যা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রচেষ্টা।"

''এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক আকাঙ্খা এবং ক্ষোভের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধি কোনটিই নিয়ে আসতে পারে না।"

''জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে বি জে পি এবং পি ডি পি'র ভিন্ন অবস্থান ও ধারনা সত্ত্বেও, বিদ্যমান রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থা বিবেচনা করে, বিশেষ মর্যাদা সহ ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিকেই মেনে চলা হবে।"

''অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন পূর্বতন এন ডি এ সরকারের আমলে, 'ইনসানিয়াৎ, কাশ্মীরিয়াৎ অউর জামহুরিয়াৎ'-এর মনস্তত্বকে ভিত্তি করে হুরিয়ৎ কনফারেন্স সহ কাশ্মীরের সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ একই নীতিকে অনুসরণ করে, জোট সরকার আদর্শগত অবস্থান ও রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত অংশের সাথে আলোচনা শুরু করবে। এই আলোচনা জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত অমিমাংসিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বৃহৎ পরিসরে সহমত গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।" [সূত্র ঃ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৯ আগস্ট ২০১৯]

কিন্তু বাস্তবে, গত ৫ আগস্ট ২০১৯, চুক্তি পত্রে উল্লিখিত প্রতিটি বাল্যকে নস্যাৎ করে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান জনিত সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে কার্যত বাতিল করা হল এবং কাশ্মীরের কোন অংশের মানুষের সাথেই কোনরকম আলোচনা না করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে (জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে) পরিণত করা হল। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

আমাদের অজয়দা

আমার স্ত্রীর এস্টিমেশনও ফেল করে গেছিল। অবশ্য বোধহয় অজয়দা আমাদের মুখে-চোখের অবস্থা দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিজেকে শেষমেশ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আবার আমরা কলকাতায় এলেও অজয়দা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। বউদির (অজয়দার স্ত্রী) হাতের পায়েসের কথা আমার এখনও মনে আছে। অজয়দার সাথে সর্বভারতীয় সংগঠনেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সেখানেও দেখেছি অন্যান্য রাজ্যের নেতারা অজয়দাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। একইসাথে তিনি দারুণ দক্ষতায় সর্বভারতীয় সংগঠনে এবং সংসদে তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন। অজয়দা খুব ভাল আবৃত্তি করতেন, এটা তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন সবাই জানেন। আমি একবার সারা ভারতব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচীতে, অজয়দার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর বড় পুত্রকে মঞ্চে তুলে দিয়েছিলাম আবৃত্তি করার জন্য। এই সাহসটুকু পেয়েছিলাম অজয়দার অতটা স্নেহ পেয়েছিলাম বলেই। □

৩৭০ ধারায় কী লাভ হয়েছে ? কাশ্মীরের কী লাভ, ভারতেরই বা কী লাভ ?

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা গণপরিষদেই এই ধারার মান্যতা দিয়েছিলেন। বরং গণপরিষদে বলা হয়েছিল, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি গণভোটের ওপর নির্ভর করবে, এ বিষয়ে গণপরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরবর্তীকালে কাশ্মীরের সংবিধান পরিষদ ৩৭০ নং ধারার ভিত্তিতে ভারতভুক্তিকে চূড়ান্ত করায় গণভোটের প্রশ্ন ওঠেনি। বস্তুত ৩৭০ নং ধারা প্রত্যাহৃত হলে ভারতভুক্তির মৌলিক ভিত্তিই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

১৯৫৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সংবিধান পরিষদ জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে অনুমোদন করে। সংবিধানে লেখা হয় 'জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে'। ১৪৭ নং ধারায় লেখা হয় ভবিষ্যতে কোনো আইনসভা এই ভারতভুক্তির ধারা সংশোধন করতে পারবে না। অর্থাৎ ৩৭০ নং ধারা কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে সম্পূর্ণ করার পথে বাধা, এই প্রচার একেবারেই অসত্য ও অনৈতিহাসিক। যেহেতু ১৯৪৮ বা ১৯৫০-এ কাশ্মীরের সংবিধান পরিষদ ছিল না, অথচ বলা হয়েছিল রাজ্যের সংবিধান পরিষদই স্থির করবে এই ধারা মেনে নেবে কিনা, তাই ৩৭০ নং ধারাকে তখনো পর্যন্ত সাময়িক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কাশ্মীরের সংবিধান পরিষদ তা মেনে নেবার পরে ৩৭০ নং ধারা ভারতীয় সংবিধানের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়।

৩৭০ নং ধারায় কাশ্মীরের জনগণ পেয়েছেন ঐতিহাসিক পরিচয়সত্ত্বা রক্ষার গ্যারান্টি, অন্যদিকে এই ধারার জন্যই ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের রাজনৈতিক-সাংবিধানিক সংযুক্তি। অন্যথায় গায়ের জোরে কাশ্মীর শাসন করতে হতো। যদিও বারবারই ৩৭০ নং ধারার মর্মবস্তুকে খাটো করা হয়েছে। এর ফল ভালো হয়নি। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে, উগ্রপন্থীরা তার সুযোগ নিয়েছে। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

রাজ্য কাউন্সিলের অষ্টম সভা

অবিলম্বে প্রদান, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা সহ ৬ (ছয়) দফা দাবিতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবে। জেলায় অনুরূপভাবে জেলাসদরে মিছিল হবে। অর্ধ দিবস / পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে বিকাল ৩টায় এই জমায়েত ও মিছিলের কর্মসূচী হবে। কলকাতার কেন্দ্রীয় মহামিছিলে পার্শ্ববর্তী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলার কর্মচারীরা যুক্ত হবেন।

আগামী ১৯-২২ আগস্ট ২০১৯ চারদিন ব্যাপী কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ব্লকস্তর পর্যন্ত জেলা সফরের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। আসন্ন রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের কাঠামো পুনর্গঠনের প্রশ্নে এই সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কর্মী নেতৃত্বদের যুক্ত হতে হবে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে দেশ, রাজ্য ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির বিপদকে মতাদর্শের ভিত্তিতে চেতনাকে শাণিত করেই সাংগঠনিক ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের কর্মী সংগঠক নেতৃত্বদের মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফল দিয়ে বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা যায় না। স্বাধীনতা পরবর্তীতে নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে বামপন্থীদের শক্তি সর্বাপেক্ষা হ্রাস পেলেও বামপন্থীদের শক্তিহ্রাসের পরিণতি শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রত্যক্ষ করছেন দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েই নরেন্দ্র মোদির সরকার দেশের ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। রেল-ব্যাঙ্ক, বীমাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নতুন করে গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রম আইন সংশোধনের নামে মালিকশ্রেণীর হাত শক্ত করা হচ্ছে। এক কথায় বামপন্থীরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে সমস্ত দাবিগুলি উত্থাপিত করেছিল, কৃষকদের স্বার্থে যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল তার প্রতিটি দাবিই প্রাসঙ্গিক রয়েছে। বামপন্থীরা পুনরায় এই দাবিগুলির সমর্থনে রাস্তায় নামছেন, আমাদেরও শ্রমজীবী মানুষের সমর্থনে সোচ্চার হতে হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকীর সূচনা হবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর। একে কেন্দ্র করে জেলা / অঞ্চলগুলিকে আলোচনাসভা সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিষয়ঃ বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ ও বিদ্যাসাগর।

সম্মেলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ১০টি অন্তর্ভুক্ত ও ১টি সহযোগী সমিতির সম্মেলন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন কম. অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্বরণসভা আগামী ১৬ আগস্ট বিশাল ৫.৩০ মিনিটে কলকাতার ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনের স্থান বর্ধমান শহর কম. অজয় মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত হবে। রাজ্য সম্মেলন মঞ্চ নামাঙ্কিত হবে প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেনের নামে এবং বুক স্টল নামাঙ্কিত হবে প্রয়াত কমরেড অশোক রায়ের নামে যিনি বর্তমান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ব্লক মহকুমা ও জেলা সম্মেলন বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবনাও তিনি রাজ্য কাউন্সিল সভায় পেশ করেন। একই সঙ্গে তিনি বর্ধমান জেলাকে অভিনন্দন জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিন দান মেলার মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি পশ্চিমবঙ্গ প্রেস এন্ড ফর্মস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিও তিনি সিদ্ধান্ত আকারে রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনায় পরবর্তীতে ১৯টি জেলা এবং কলকাতার ৭টি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন ব্লক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কাঠামোর পুনর্গঠন হবে। কাঠামোর পুনর্গঠন মানে প্রজন্মেরও পুনর্গঠন। প্রবীণ ও নবীনের মেলবন্ধন ঘটবে। এবারের মহকুমা সম্মেলনগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৯-২২ আগস্ট ২০১৯ ব্লক সফর হবে, ব্লক সফর মানে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী নয়। একে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখতে হবে। নির্বাচন পরবর্তীতে হতাশা, বিহ্বলতা তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে একে মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি টু-পিলার অরগানাইজেশন। তাই সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতি এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে একযোগে কাজ করতে হবে। জেলা সংগঠনের ক্ষেত্রে সমিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। আজকের বহুমুখী আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে বিকল্প ভাষ্য নিয়ে কর্মচারীর কাছে পৌঁছাতে হবে। কর্মচারীর ভাবনার সাথে সংগঠনের ভাবনার মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। কাঠামোর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চেতনার স্তরকে উন্নত করতে হবে। পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদানগুলিকে ব্যবহার করতে হবে। অতীতের নেতৃত্বের পরামর্শ তাদের আন্দোলনের ইতিহাসকে পাথেয় করে আজকের পরিস্থিতিতে লড়াই আন্দোলন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৫৬ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে সমস্ত দাবিই অর্জিত হয়েছে লড়াই আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। তাই আজকেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামই একমাত্র পথ আর এই সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনার প্রশ্নে কর্মী-নেতৃত্বকে হতে হবে সাহসী-আত্মত্যাগী সৎ মানসিকতা সম্পন্ন। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা শ্রমজীবী মানুষ। তাই শ্রমজীবীদের মতাদর্শে নতুন করে সংগঠনের পুনর্নির্মাণ আমাদের করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা সহ জেলা / অঞ্চলের নেতৃত্বে বক্তব্য সহ যুগ্ম সম্পাদকের জবাবী বক্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন বিরাজমান পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে চাই মতাদর্শে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, আশু দাবি অর্জনে চাই লাগাতার সংগ্রাম-আন্দোলন তাই ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার প্রশ্নে ব্লকস্তর থেকে সংগঠনের প্রতিটি স্তরের পুনর্নির্মাণ আমরা সেই লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হই। □

দেবাশিষ রায়

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব

টাকা ও সর্বোচ্চ ১১ হাজার টাকা। এর বাইরেও বেশ কয়েকজন অনিবার্য ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত হতে না পারার জন্য টেলিফোনে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অনতিবিলম্বে অর্থদানের কথা জানিয়েছেন।

অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় সাত শতাধিক কর্মী-সংগঠক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সমগ্র সভাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। জেলার প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমানে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডাঃ অনুপ সাহাকে সভাপতি, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জীকে সম্পাদক করে, ১২ই জুলাই কমিটির জেলা কমিটির আহ্বায়কদ্বয় সহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ভ্রাতৃপ্রতীম গণসংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দকে উপদেষ্টামণ্ডলী ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে যুক্ত করে মোট ১৯০ জনকে নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় প্রাথমিক প্রস্তাবনা রাখেন বর্ধমান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক। তারপর জেলা ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে রণজিৎ দত্ত, সি.আই.টি.ইঠ পূর্ব বর্ধমান জেলার পক্ষে জেলা সম্পাদক কমঃ সুকান্ত কোনার, পূর্ব বর্ধমান জেলা ডি.ওয়াই.এফ.অই.-এর পক্ষ থেকে প্রলয় আইচ এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বক্তব্য রাখেন। ঐ সভাতেই ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত 'লোগো'টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক।

অভ্যর্থনা কমিটির দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের জন্য ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি ও ৯টি উপসমিতি গঠিত হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, সম্মেলন তহবিলে এই জেলার পারিবারিক পেনশনারগণ ১০০ টাকা, ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন / পেনশন প্রাপকগণ ২০০ টাকা এবং তদূর্ধে ৪০০ টাকা হারে সম্মেলনে তহবিলে কুপনের মাধ্যমে অর্থ দান করবেন। এছাড়াও জেলা ও মহকুমা কমিটির সদস্যগণ একদিনের বেতন / পেনশন রসিদের মাধ্যমে প্রদান করবেন। সম্মেলন তহবিলে একাধিক কুপনের মাধ্যমে অর্থদানের জন্য সাধারণ সদস্যদের নিকট আহ্বান জানানো হয়েছে। অবশ্য দানমেলায় যাঁরা অর্থ দান করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সম্মেলন তহবিলে কুপন বা রসিদের মাধ্যমে অর্থদানের ব্যাপারটি ঐচ্ছিক।

বর্তমান আমরা যে অবস্থায় পৌঁছেছি, তাতে আর্থিক প্রসঙ্গে শঙ্কামুক্ত হয়ে প্রচারসহ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে নতুন ভাবনা গ্রহণ ও রূপায়ণে আমরা ব্রতী হয়েছি।

পরিশেষে রাজ্যব্যাপী সমগ্র সাংগঠনিক নেতৃত্বের নিকট থেকে এ পর্যন্ত যে পরামর্শ ও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি আগামীদিনেও তা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা রাখছি। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 3rd Issue, July 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব

করালী চ্যাটার্জী
সম্পাদক, বর্ধমান জেলা শাখা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে। রাজ্য কাউন্সিল সভায় এই সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হলো, তখন আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল যুগপৎ আনন্দের ও গর্ব্বের, সাথে সাথে দুশ্চিন্তার। কারণ আমাদের এই জেলাতেই দশম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। সেই সম্মেলনের সুবিশাল কর্মকাণ্ডে সদ্য নিযুক্ত একজন কর্মচারীর দর্শক হিসেবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমার মনোজগতে দুশ্চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল। সম্মেলনের নির্ধারিত দিনের মাত্র তিন সপ্তাহে আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হানাহানির মোকাবিলা করেই ঐ সম্মেলন বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। যার পিছনে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও দৃঢ় ভূমিকার পাশাপাশি রাজ্যের সচেতন জনগণের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর বর্তমানে রাজ্যে যে সরকারটি অধিষ্ঠিত, সেটি শুধুমাত্র স্বৈরতান্ত্রিকই নয়, সবদিক থেকেই জনস্বার্থ বিরোধী। অপরদিকে কেন্দ্রে বর্তমানে অধিষ্ঠিত সরকারটি তো মতাদর্শগতভাবে ফ্যাসিস্ট ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অন্যতম কারক শক্তি এবং সর্বতোভাবে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী লগ্নী পুঁজির আগ্রাসী ভূমিকা ও শ্রমিক সঙ্কোচন নীতির অনুসারী আমাদের দেশের ও রাজ্যের দুই সরকারের কল্যাণে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সংখ্যার বিপুল হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়াও তীব্র অর্থনৈতিক বঞ্চনার ফলে কর্মচারী সমাজ যে দূরবস্থার মধ্যে রয়েছেন, তাতে সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কিভাবে করা যাবে এটাই ছিল আমাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ।

যাই হোক, সম্মেলনের দায়িত্ব যখন আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি তখন সমস্ত উদ্বেগ আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজে নামতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষা "স্বৈরতন্ত্রীরা কখনও শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে শ্রমজীবী মানুষ", এই প্রত্যয়ে স্থিতু হয়ে জেলা সম্পাদকমণ্ডলী পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু করে। রাজ্য কাউন্সিল সভায় আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্ত জেলা ও কলকাতার অঞ্চল কমিটিগুলির এবং অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সমিতির নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতার ঝুলি উজার করে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ছিল আমাদের সাহসের অন্যতম উৎস।

অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা দুটি পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। (১) জেলার সদস্য কর্মচারীদের নিকট থেকে সম্মেলন তহবিল সংগ্রহ। যা অনিবার্য ভাবেই হবে রাজ্যস্তরে গৃহীত তহবিলের হারের থেকে কিছুটা বেশি এবং (২) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির মধ্যে বর্তমানে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে সাধ্য মতো দানের আহ্বান জানিয়ে 'দানমেলা' সংগঠিত করা। একইসাথে মহকুমা কমিটি পর্যন্ত একদিনের মূল বেতনের সম পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত।

'দানমেলা' প্রসঙ্গে আমাদের কোনো অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। আমরা অতীতে আমাদের জেলায় কর্মরত ছিলেন এবং সংগঠন কাঠামোর মধ্যে যুক্ত ছিলেন, (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং অন্তর্ভুক্ত সমিতি উভয় স্তরেই) বর্তমানে এই জেলাতেই বাস করেন অথবা অন্য জেলায় বাস করেন এবং ১০০০ জন অনুগামীকে চিঠি দিয়ে ১৪ জুলাই দানমেলা ও অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় অংশগ্রহণের আবেদন জানাই।

সিদ্ধান্ত হয় ১৪ জুলাই, ২০১৯ (একই দিনে) অভ্যর্থনা কমিটি গঠন ও দানমেলা সংগঠিত করা হবে। দান মেলা সংগঠিত হবে বেলা ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত এবং তারপর ২টা থেকে হবে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং অন্তর্বুক্ত সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বএবং সমস্ত জেলা ও কলকাতার অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটিগুলির নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া জেলার অভ্যন্তরে ১২ই জুলাই কমিটিসহ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 'দানমেলা'র মতো একটা নতুন ভাবনার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সমস্ত সংশয়কে উড়িয়ে দিয়ে অর্থ দাতাগণ ছাড়াও জেলার বিভিন্ন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ বিপুল উৎসাহ নিয়ে নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই কর্মচারী ভবনে উপস্থিত হন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সাধারণ সম্পাদক সহ অধিকাংশ সদস্য ছাড়াও ১৮টি অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে এবং ১২টি জেলা ও কলকাতার অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় উপস্থিত থেকে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত ও জেলার কর্মী সংগঠকদের মনোবলকে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেন।

দানমেলায় ৩২৪ জন কর্মচারী ও পেনশনার মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১০ লক্ষ ১ হাজার টাকা প্রদান করেন। দানের অঙ্ক ছিল সর্বনিম্ন ৫০০

▶▶ *সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে*

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ

৬ দফা দাবিতে কলকাতায় ও জেলায় জেলায় মিছিল ও সমাবেশ

বক্তব্য রাখছেন ডঃ সুজন চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় মিছিলের ট্যাবলো

জলপাইগুড়ি

বাঁকুড়া

পূর্ব মেদিনীপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর

দার্জিলিং

হুগলী

নদীয়া

পুরুলিয়া

আলিপুরদুয়ার

কলকাতায় মিছিল শেষে সভার একাংশ

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচী চলছে। এই কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। — কেন্দ্রীয় কমিটি

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।